

# খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

## রেজাউল করিম সিদ্দিকী

প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ইংরেজ শাসন এবং ২ দশকের বেশি পাকিস্তানী শাসন শোষণের যাতাকলে পিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত অপুষ্টির স্বীকার ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পর ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া ২০০৭-০৮ সালের বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের সময় খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও সারের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পর পর এদেশের খাদ্য চাহেদার বেশিরভাগ পূরণ হতো বৈদেশিক খাদ্য সহায়তা বিশেষ করে পিএল ৪৮০ এর আওতায় আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে খাদ্য সাহায্য হিসেবে বাংলাদেশে ১.৩ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য সাহায্য আসে যা মোট আমদানির ৩৫ শতাংশেরও বেশি। ২০০৫ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) এর তথ্য অনুযায়ী দেশের চল্লিশ শতাংশ দরিদ্র মানুষ তাদের আয়ের ৭০ শতাংশ শুধুমাত্র খাবারের জন্য ব্যয় করতো। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দিনে ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির কম খাবার গ্রহণ করত একজন মানুষের দৈনিক ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা ২১২২ কিলো ক্যালোরির প্রায় ৮৫%।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য কমতে থাকে। ফলে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সরকার আমদানিকৃত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালের বৈশ্বিক খাদ্য সংকট এবং খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে খাদ্য ঘাটতি পূরণে আমদানী নির্ভরতা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর অভিঘাত ও ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটেও বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবন যাপনের জন্য দেশের সকলের সকল সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ থাকাকে বোঝায়। তবে খাদ্য নিরাপত্তাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকাকে বুঝায়। অন্যদিকে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে নিজস্ব উৎপাদন, বাজার অথবা সরকারি সরবরাহ থেকে সমাজের সকলের জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকাকে বোঝায়। কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বন্যা, সাইক্লোন, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়শও এদেশের খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। মাত্র ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশে ১৬ কোটির বেশি লোকের বাস। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু বসতবাড়ি, কলকারখানা, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রতিবছর এদেশে ১% হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ১.২ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন হ্রাস পাবে যা বার্ষিক ধান উৎপাদন প্রায় চার শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে খাদ্যশস্যের মূল্য ও জোগানের স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্ব বাজারের উপর আর নির্ভর করা যায় না। ফলে এদেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার স্বনির্ভরতা(self Reliance) থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা(S Sufficiency) নীতি গ্রহণ করেছে। সময় উপযোগী ও কার্যকর এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ খাদ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি উন্নত জাতের শস্য ও তার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, এদের বিস্তার, প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা, সার, কীটনাশক, বীজ ও আনুষঙ্গিক কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা। এজন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থায় (NARS) ৫০০ এর বেশি উন্নত জাতের শস্য ও তাদের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কম ফলনশীল স্থানীয় জাতের পরিবর্তে এসব উন্নত জাতের ফসল আবাদ করায় ফলন বেড়েছে, উৎপাদন খরচ কমেছে এবং লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিজেল ইঞ্জিন আমদানি উদারীকরণ, আমদানি শুল্ক হ্রাসকরন, ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্রপাতি বিশেষ করে অগভীর নলকূপের উপর থেকে স্ট্যান্ডারডাইজেশন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মাধ্যমে সেচ কার্যে ভর্তুকি প্রদান করায় কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে সরকার বেসরকারি খাতকে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানীর সুযোগ দেয়। ফলে উচ্চ ফলনশীল জাতের হাইব্রিড ধানের বীজের বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সারের বিপণন ব্যবস্থা বেসরকারিকরণ করা হয় ১৯৭৮ সালে যা আশির দশকে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে বেসরকারি ডিলারদেরকে ফ্যাক্টরি ও বিএডিসি সরবরাহ কেন্দ্র হতে হ্রাসকৃত মূল্যে সার সংগ্রহ ও বিপণনের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজারে সারের তীব্র সংকট দেখা দেয়। ফলে ১৯৯২ সালে প্রত্যাহারকৃত নন ইউরিয়া সারের উপর ভর্তুকি পুনরায় চালু করা হয়। বর্তমান অবধি সরকার ট্রিপল সুপার ফসফেট (TSP) ও মিউরেট অফ পটাশ (MP) সারে অধিক পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করেছে। এর ফলের রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে, জমির উর্বরতা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার গত ১৫ বছরে এদেশে কৃষিখাতে যে ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই অকল্পনীয়। খাদ্য ঘাটতি নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব সরকারই কম বেশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিগত ১৫ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা অতীতের যে কোন সময়ের সফলতা ও অগ্রগতির চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টন। এ সময় দেশে গম, ভুট্টা, আলু ও সবজির মোট উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার, ৭ লক্ষ, ৫ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান, প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির সহজলভ্যকরন, কৃষির আধুনিকীকরণ, উন্নত জাতের ফসল ও তার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ধারাবাহিক গবেষণা, কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শসেবা প্রদান ইত্যাদি কারণে গত ১৫ বছরে এসব খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৪৫ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে ভুট্টা, আলু ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৪ লক্ষ, ১ কোটি ৪ লক্ষ ও ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কৃষিপণ্য বিশেষ করে খাদ্যশস্য বিপণন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা হয়েছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বাজার ব্যবস্থায় একচেটিয়া ফরিষাদের দৌরাত্ম প্রতিহত করতে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)র মাধ্যমে সারাদেশে পাঁচ কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে চাল, ডাল, আটা, চিনি, ভোজ্যতেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এজন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময় দেশের সকল সরকার কমবেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার একে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে সর্বাঙ্গিক কর্মসূচির হাতে নিয়েছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করেছে ও করছে। সকল স্তরের জনগণ ইতোমধ্যেই এর সুফল ভোগ করছে। আগামী ২০০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে এই সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার